প্যারেন্টিং

শিরোনামের প্রয়োজন নেই

Nusrat Rahman

2020-06-12 16:26:54 +0600 +0600

16 MIN READ

স্নিগ্ধার প্রতিটা দিন একই রকম। কলেজ যাওয়া, আসা, বাড়ি ফিরে একটু টিভি দেখা, পড়ার টেবিলে বসে থাকা। অগোছালো ঘরটার দিকে একটা বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকায়। উদ্যমগুলি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, শরীরটা টেনে টেনে সব পরিপাটি করতে গিয়েও মাঝপথে থেমে যায়। কীসের জন্য করবে সে?

নিজের রুমের বাইরে এসে দাঁড়ালে আব্বু আম্মুর রুমটা দেখতে পায় সে। জানে, ওখান থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসবে না কখনোই। বেশির ভাগ সময় ওঘরে যে কোন একজন থাকে। অপরজন টিভির রিমোট হাতে নিয়ে পার করে ঘন্টার পর ঘন্টা। ঘরে একমাত্র সচল মানুষ কাজের বুয়াই। নিজের মনে কাজ করে.. বুঝে গেছে কবরের মত এই বাড়িতে টিকে থাকতে হলে নিরব হয়েই কাটাতে হবে।

এ বাড়িতে তাই কোন প্রাণ নেই। প্রাণীগুলো বোধহীন রোবটের মত, কেবল নিজে নিজের কাজ নিয়ে থাকতে জানে। কবে তারা সবাই মিলে পিকনিক এ গিয়েছিল? বা কারো বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল? মনেও করতে পারেনা স্নিগ্ধা। কবে কোন কথায় আঘাত না করে একসাথে খাবার টেবিলে গল্প করেছিল? কবে আম্মু তার অনেক ব্যর্থতার গল্প শুনে বুকে টেনে বলেছিল. 'ইশ মা! তোকে সবাই এত কষ্ট দেয়?' আচ্ছা, আম্মু কবে 'মা' বলে ডেকেছিল? এতক্ষণে খেয়াল হল তার, অনেক বান্ধবীর মাকে তার এত ভাল লাগে কেন! ওরা মা বলে ডাকে, তাই।

ওর বাবা খুব ভালমানুষ, কিন্তু রাগলে কান্ডজ্ঞান থাকেনা। সে সময় বাবার মুখের কথা শুনে সে পাথর হয়ে থাকে, এটা তার বাবা? মাও খুব ভালমানুষ, শুধু তীব্র আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন। একবার কেউ কষ্ট দিলে কখনো আর ভোলেনা। ওদের সব ভাল, শুধু কথাগুলো একটু শ্লেষ জড়ানো। শুনতে ভালই লাগে, কিন্তু বুকের মধ্যকার খচখচ ভাবটা যায়না। চোখদুটোও ওর ভারি বেয়াদব, যখন তখন ঢল নামে। তাই বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে সে পারতপক্ষে সবাই একসাথে থাকলে ওখানে যায়না।

ঘরটা তার কাছে একটা দামি খাঁচার মত, সবাই টিপটপ, সব ভাল, তবু মন চায়না ঘরে ফিরতে। কিন্তু বাইরেই বা সে কোথায় যাবে? বান্ধবীদের সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের মত নিজেকে সাজাতে ত সে পারেনা। ওদের পাশে যে ওকে ভীষণ ম্যাড়মেড়ে লাগে! প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ উপদেশ দেয়, একটু পার্লারে যাও, ফেসিয়াল করে আস, স্মার্টভাবে চল। ও ভেতরে ভেতরে আরো কুঁকড়ে যায়, যদি পুরোপুরি স্মার্ট হতে না পারি? যদি টইটই সব ঠিকঠাক মত করতে না পারি? ওরা কি আমাকে নিয়ে আরো হাসাহাসি করবে? বারবার স্মার্ট হওয়ার উপদেশ শুনতে শুনতে সে বুঝে গেছে ওর আচার ব্যবহার, চালচলনে বড় কোন খুঁত আছে, যেটা খুব সহজেই চোখে লাগে। আজকাল তাই ওর চেষ্টা অদৃশ্য হওয়ার।

স্নিগ্ধা প্রাণপন চেষ্টা করে ভাল রেজাল্টটুকুকরে যাচ্ছে, কারণ রেজাল্ট খারাপ হলে মানুষের আরো অপমান সহ্য করার শক্তিটা ওর নেই। আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে যখন সে দেখে তখন কেন জানি নিজের চোখ দিয়ে দেখতে পায়না। অপরের চোখ দিয়ে দেখে। মুহূর্তেমনে পড়ে যায় খুব কাছের মানুষেরা গল্পোচ্ছলে কী কী বলেছিল। আচ্ছা, কেউ কখনো কেন বলেনা, তুমি একটু বক্তৃতা দেয়ার প্র্যাক্টিস কর, আত্মবিশ্বাস বাড়বে, পনের বছর পর কার জন্য কী করবে, একটা স্বপ্ন দেখ, উৎসাহ পাবে। কেন কেউ বলেনা, পোশাক আশাক, রূপচর্চার বাইরেও একটা জিনিস আছে, তোমার আত্মা, তোমার মন। ওখানটায় তোমার মত সুন্দর আর কেউ নেই! তোমার সব বান্ধবীরা মানুষের প্রশংসা কুড়াতে হ্যাংলার মত দ্বারে দ্বারে ঘুরছে, আর তুমি তোমার সুন্দর মনটাকে খুব যত্ন করে আদর করে রেখেছ। হাজারটা মানুষের অপমানেও তুমি কিছু রিঅ্যাক্ট করনা। শুধু চোখটা বড় বড় করে তাকাও। তোমার চুপ করে থাকা দেখে মানুষ ভাবে তুমি বোধহয় বোধহীন। আরো শক্ত করে না বললে তোমার মগজে পৌঁছাবে না। তুমি মুখ ফুটে তবু ত বল না, 'আমার আত্মবিশ্বাস ত কবেই তোমরা শেষ করে দিয়েছ, আত্মাটাকেও কি মেরে ফেলতে

চাও?’

স্নিগ্ধা সাতপাঁচ ভেবে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসে। শূন্য দেয়ালগুলো তার বড় আপন। কেবল এই জায়গাটাতেই সে যখন তখন মুখ লুকাতে পারে। [১]

* * *

স্নিগ্ধার দিনগুলো সবচেয়ে করুণ হয় যখন কোন উৎসব আসে। প্রায় নেই হয়ে যাওয়া রিলেটিভদের সাথে যখন দেখা হয়, ওর ঘরের মানুষগুলোর বিভাজন যেন ওর ভেতরটা এতটুকুকরে ফেলে। খুব রাগ হয় মা’র উপর, বাবার উপর। কেন পৃথিবীতে আনলে আমাকে? কেন এই উৎকট অস্বস্তিকর পারিবারিক গেট টুগেদারে আমাকে সং বানানোর খেলা খেলবে? কোন প্রোগ্রামে যেতে ওর ইচ্ছে হয়না। কিন্তু না গেলে যে আরো কতগুলো তীর্যক মন্তব্য আর অসংলগ্ন উপদেশ সইতে হবে!

বাবা মায়ের উপর রাগ হয়, আবার মায়াও লাগে খুব। এই মানুষগুলোর মত দুঃখী আর ক’জন আছে? সবচেয়ে কাছের যে সম্পর্কটা থেকে ওরা নির্ভরতা পেতে পারত, সেটা বদলে গেছে ইগো রক্ষার যুদ্ধে। ওদের আর আমি ছাড়া কী আছে? তাই ত আমার এতটুকুস্খলন ওরা সইতে পারেনা। উন্মত্তের মত একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। আমি যদি কষ্ট দেই এরা যাবে কোথায়? এক আমাকে নিয়েই ত ওদের যা কিছু স্বপ্ন, যা কিছু বেঁচে থাকার অবলম্বন! এসব ভেবে অনেকবার আত্মহত্যা করতে গিয়েও পারেনা সে। সাহসও বোধ করি হয়না অতটা। মৃত্যু কেমন হয়? আমি মরে গেলে কি আব্বু আম্মু কাঁদবে? কতটুকু কাঁদবে? আহ্, আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদবে, তাই না? ইস, আমি যদি ওদের পাগল পাগল কান্না দেখতে পেতাম!

স্নিগ্ধার ইচ্ছে হয় সব কিছু ফেলে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে। নিজের মত থাকবে, কাউকে নিয়ে ভাবতে হবেনা.. কিন্তু আব্বু আম্মুকে যে বড় ভালবাসে ও। কত রাত চুপিচুপি দোয়া করেছে বাবা মার সব যেন ঠিক হয়ে যায়। ঠিক একটা মুভির মত যেন ওরা খুব খুব সুখে থাকে। একা একাই ফ্যান্টাসি গড়ে স্নিগ্ধা। কখনো ওর মরে যাওয়ার, কখনো বাবা মায়ের খুনসুটির, কখনো নিজের কথাও ভাবে সে। প্রিন্স চার্মিং, আমার প্রিন্সও ঠিক এমন করেই আমাকে কষ্ট দেবে, তাই না? আচ্ছা, আব্বু কি কখনো আম্মুর প্রিন্স চার্মিং ছিল? ধ্যাৎ, কী সব ভাবছি!

স্নিগ্ধা কলেজ, কোচিংএর বাইরের পৃথিবীটাতে খুব নাজুক, ও জানেই না কী করে অচেনা মানুষের সাথে কথা বলতে হয়, কী করে সমস্যা সমাধান করতে হয়, বা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ওকে ত কেউ শেখায়নি! তবে হ্যা, এই গুণগুলো না থাকার কারণে ভর্ৎসনা পেয়ে ফেলেছে বেশ কয়েকবার, নিজের ভেতরে গুটাতে গুটাতে ছোট্ট একটা বিন্দু হয়ে যেতে পারত যদি সে! ভয়ই করে তার, কী করে মানুষের চাওয়া পূরণ করবে সে? কখনো কি পেরেছে? এইটুকুবয়সে কত বড় বড় কথা চিন্তা করে স্নিগ্ধা। আচ্ছা, অন্যরা কেন চিন্তা করে না? বাবা মা, শিক্ষক – এরা ত আমার অনেক বড়! ওরা কেন এত অন্ধ?

টিভির প্রোগ্রাম মন ভাল করতে পারেনা। কী সব আজগুবি ফান এদের। গল্পের বই পড়তে বেশ লাগে, ফ্যান্টাসি গুলো বেশ বাধন ছাড়া হয়! এক আধজন বন্ধুবান্ধব আছে, কিন্তু কেমন যেন হাঁপ ধরে যাওয়া আলোচনা এদের। স্নিগ্ধার নিজের মনের জগতে সে একা থেকেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। খুব বেশি ভালবাসা পেতে তার অস্বস্তি লাগে। বিষন্নতা, একা থাকা – এটা তার অনেক দিনের সঙ্গী। বোধকরি জীবনসঙ্গীর থেকে উদাসীনতা পেলেই তার স্বাভাবিক মনে হবে।

পাঠক, বলতে পারেন, স্নিগ্ধা আর চার বছর পরে বিয়ে করে নিজের সংসারে গিয়ে কী করবে? আবেগ, অভিমান, হতাশা, অপরিপক্কতা, অদূরদর্শিতা, জীবনের সব কিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা ওকে কেমন জীবন সঙ্গী হিসেবে গড়ে তুলবে? একজন মা হিসেবে সে কেমন হবে? চাকরির কথা নাহয় বাদই দিলাম। এই মেয়েটা যদি ভারসাম্য করে চলতে না পারে, তার পরিবারেও কি তবে তার বাবা মায়ের গল্পেরই পুনরাবৃত্তি হবে? এর শেষ কবে, কোথায়?

* * *

লিফটে পাশের ফ্ল্যাটের এক বড় আপুর সাথে স্নিগ্ধার প্রায়ই দেখা হয়। আপুটা একটু কেমন জানি। হুট করে একদিন ডেকে

বলে, এই, আমি ফুচকা খেতে যাচ্ছি, যাবে আমার সাথে? এই সামনেই। কি মনে করে জানি রাজি হয়ে যায়। ফুটপাথের ওপর বিছানো টিনের বেঞ্চে বসে আপন মনে বকবক করতেই থাকে মেয়েটা, কথার মাঝখানেই বলে, আমার এত বড় নাম 'প্রতীতি' বলে ডাকার দরকার নাই। আর আমি ত মোটে দুই বছরের বড়, দুই বছর পর ত তুমি আমার সমানই হয়ে যাবে, তুমি বরং আমাকে পৃতিপু বলে ডেক। আর আপনি ফাপনি বলার দরকার নাই। আমি মোটে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। আমাকে কেউ আপনি বলেনা। ওর কথার ধরণ শুনে স্নিগ্ধার খুব হাসি পায়, ওকে দেখে যেন মনে হয় পৃথিবীর কোন কিছু নিয়েই পৃতিপুর কোন টেনশন নেই। একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে আপু কী বলছে, এই দেখ, এই যে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি না, এর ফুলগুলির পাপড়ি গুলি কিন্তু চারটা হুবহু একরকম, একটা অন্যরকম, বড়, হলুদ। কুঁড়ি থাকতে আমি একবার পাপড়ি খুলে দেখেছিলাম, বড়টা বাকি চারটাকে ঢেকে রাখে। একবার একটা বিড়ালকেও দেখি চারটা বাচ্চাকে জড়ায় গোল করে ঘুমাচ্ছে। স্নিগ্ধার কানে অর্ধেক কথা ঢোকে, বাকিটা সময় সে আপুকে ভাল করে লক্ষ্য করে। উনার কি একেবারেই চিন্তা নেই মানুষজন কীভাবে তাকাচ্ছে, বা এরকম পোশাকে তাকে কেমন দেখাচ্ছে? আপুকে সে সবসময় এরকমই দেখে আসছে। বলি বলি করে বলেই ফেলল, পৃতিপু, তুমি ফ্রেন্ডদের সাথে বের হওনা? হবনা কেন? এইমাত্র এক ফ্রেন্ডের দাওয়াত থেকে আসলাম, বুঝলি, ব্যাটন রুজে মনে হয় ড্রেস কোড আছে, আমাকে যে কী লাগতেসিল, হি হি... সম্বোধনটা তুই এ নেমে এসেছে খেয়াল করলেও খুব স্বাভাবিকই লাগে স্নিগ্ধার। হঠাৎ করে ওর মনটা ভাল হয়ে যায়।

এরপর থেকে দুই সপ্তাহ পরপরই পৃতিপু একবার স্নিগ্ধার খোঁজে বাসায় হানা দিয়ে যায়। পড়ায় ব্যস্ত, জোর করে টেনে হিঁচড়ে বইয়ের দোকানে নিয়ে যাবে, নাহয় টংএর দোকানে বসে চা খাবে, সবসময় স্নিগ্ধার যেতেও ইচ্ছা করেনা, যেতে না চাইলে ও খুব শীতল হয়ে যায়, এই পদ্ধতি সে অনেকবার বাবা মায়ের উপর প্রয়োগ করেছে। কিন্তু প্রতীতি যেন কোন কিছুই গায়ে মাখবেনা। ওঠ, ওঠ... তোর কী পড়া, দে আমি বুঝিয়ে দেই। এক ঘন্টার জন্য চল, এক ঘন্টার মধ্যে ফেরত আসব, প্রমিজ। রুম থেকে তাকে বের করবেই। মনটা যখন ভয়ানক খারাপ থাকে স্নিগ্ধা প্রায় পুরোটা সময় মৃত মানুষের মত হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতীতি বকবক করেই যায়।

একদিন প্রতীতি ওকে বলে, জানিস, আব্বু আজকে চা ভাল হয় নাই দেখে ছুড়ে কাপ ভেঙে ফেলসে, আমাদের ত বুয়া নাই, আম্মু অফিস থেকে এসে রেস্ট ও নিতে পারে নাই, তাড়াহুড়ায় চা বানায় দিসে.. স্নিগ্ধার চকিতে এমন অনেক ঘটনাই মনে পড়ে যায়। ও চুপ করে থাকে। প্রতীতি আবার বলে, আব্বুর জন্য খুব মায়া লাগসে আমার। স্নিগ্ধা অবাক হয়ে যায়, 'আব্বুর জন্য? কেন?' ত লাগবে না? এত বড় মানুষটা কীরকম দুর্বল.. 'দুর্বল? মানে কী?' প্রতীতি তখন বোঝায়, দ্যাখ, আম্মু কী না করে আমাদের সবার জন্য, আব্বু এই যে রাগ দেখাল, আম্মুর এখন মনে হবে না, এত কষ্টের মূল্যায়ন এই? তখন তার মনটা খারাপ হবে না? এর চেয়ে যদি রাগটা কে কন্ট্রোল করত, আর বলত, তুমি পাতিলটা ধুয়ে দাও, আমি আরেকবার চা বসাই, আজকে ভাল চা খেতে ইচ্ছা করছে, আম্মু সুন্দর হাসিমুখে আবার চা বানায় দিত। যে মানুষ ফল ভাল হবে জেনেও দুই মিনিটের জন্য নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেনা তাকে দুর্বল বলব না ত কী? স্নিগ্ধা খুব মজা পেল শুনে। তাই ত! ওর বাবার রাগের মাথায় চেঁচামেচি দেখে তাহলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, করুণা করা উচিৎ? এভাবে দেখলে কিন্তু আবার কেমন জানি বিতৃষ্ণা ব্যাপারটাও আসেনা।

কিন্তু আম্মু? স্নিগ্ধা সন্তর্পণে জানতে চায়, আন্টি খুব আপসেট, তাই না? আংকেল শুধু শুধু এমন করল? প্রতীতি হেসে বলে, 'না রে, আমার আম্মু মানুষটা অনেক সেনসিটিভ হলেও আব্বুর সাথে কখনও ইয়ে হয়না। স্নিগ্ধা হতবাক। মানে? কেন? কারণ আম্মু সবসময় বলে সংসারে মেয়েদের ক্ষমতা কতখানি এটা মেয়েরা বোঝেনা। একটা ছেলে ঘরে কমফোর্ট আর একটু সুপেরিয়রিটি ছাড়া কিন্তু আর কিছু চায়না। তুই যদি আপাতদৃষ্টিতে একটু ঝাড়ি বা রাগ হজম করিস, আর একটু যত্ন করিস, তোকে মাথায় তুলে রাখবে। তুই বছরের পর বছর ঝগড়া করেও যেটা আদায় করতে পারবিনা, রাগ হজম করলে অনেক সহজে পেরে যাবি। কারণ হঠাৎ অযৌক্তিক রাগ করে ফেলার পর একটা অপরাধবোধ হয়, তাইনা? তখন যদি পার্টনারের কাছে ডিফেন্ড করতে না হয়, উল্টো আরো কেয়ার পায়, তখন আপনি মনটা অনেক ঝুঁকে যাবে। চাই কি প্রায়শ্চিত্ত করতে একটু বাড়তি খাতিরও করতে পারে কয়েক দিন।

স্নিগ্ধার তাও ভাল লাগলনা। বলল, তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তাই বলে আংকেল এরকম যখন ইচ্ছা করবে, আর আন্টি সহ্য করবে? প্রতীতি বলে, নাহ! বললাম না, আম্মু অনেক সেনসিটিভ। আমি শিওর তিন চার দিন পর আব্বু কে চা দেয়ার সময় আম্মু আমাকে বলবে, 'এ্যাই পৃতু, এইদিক এসে দাঁড়া ত! ক্যাচ ধরিস, তোর বাবাকে চা দিচ্ছি।' ব্যাস! সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। স্নিগ্ধা হেসে ফেলল, আন্টির ত খুব বুদ্ধি তাহলে! প্রতীতি বলে, আম্মু এসব মহানবীর জীবন থেকে শিখেছে। আমাদের মহানবী কে উমর একবার কড়া কড়া কথা বলেছিল, সব সাহাবীদের সামনে। ঐটা খুবই ক্রুশিয়াল টাইম ছিল মুসলিমদের এক হয়ে থাকার জন্য। কিন্তু মহানবী উমর কে কিছু বলেন নি। পরে উমর ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায়, ভয়ে শেষ, উনার কাছে গিয়ে সালাম দিতে মহানবী সুন্দর উনার সাথে নরমাল কথাবার্তা বললেন, যেন কিছুই হয় নি। আরেকবার আয়িশা উনার সাথে গলা উঁচায় কথা বলছিল, এই দেখে আয়িশার বাবা আবু বকর আয়িশাকে মারতে যায়। তখন মহানবী ঠেকায়, আর হেসে আয়িশা কে বলে, দেখলে ত, মিয়া সাহেবের থেকে তোমাকে কেমন করে বাঁচালাম? আমার আব্বু আম্মুও আর দশটা কাপলের মত ছিল। আমার বড় ফুফুউনাদের কুরআন হাদীসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এই যে আব্বা রাগ দেখাল, আমি নিশ্চিত জানি আব্বা দুই রাকআত নফল পড়ে এই কাজের জন্য মাফ চাবে।

স্নিগ্ধা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। প্রতীতি সবই লক্ষ্য করে, কিছু বলে না। মনে মনে প্রার্থনা করে, আল্লাহ, তুমি এই মেয়েটিকে রক্ষা কর। ওর মাধ্যমে তুমি ওর বাবা মাকে সঠিক পথে ফেরাও।

* * *

প্রতীতির পড়ার ঘর। স্নিগ্ধার ঘরের চেয়ে কম অগোছালো না। জানে, মা এসে চিৎকার জুড়ে দেবে, কিন্তু মাকে ঠান্ডা করার উপায় ওর জানা আছে। এই যে মা ঢুকল, মুখ নরমাল, এ..ই যে খাটের দিকে তাকাল, মুখের এক্সপ্রেশন চেঞ্জ... অ্যাকশন! 'মা! থ্যাংকিউ! তোমার চায়ের গল্পটা খুব কাজে দিয়েছে।' মার চোখ ঘুরে গেল মেয়ের দিকে, চোখে উৎসাহ, তাই? বলেছিস? 'হ্যা মা! দাড়ি কমা সহ।' পাপিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, যাক, তোর বাবার অকাজের তাহলে ভাল দিক ও আছে। কী বলল স্নিগ্ধা? 'তেমন কিছু বলেনি মা, তবে চোখে আগ্রহ দেখলাম' তুই ত ওকে আস্তে আস্তে কুরআন পড়ার কথা বলতে পারিস। এবার বিরক্ত হল প্রতীতি, 'মা! আমার কাজ কি ওকে কুরআন পাতার পর পাতা বসে পড়ানো, না কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া? ওর সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলে ও নিজে থেকেই আগ্রহ নিয়ে পড়বে। আমার পড়াতে হবেনা।' একটু দমে যান পাপিয়া, তবে মেয়েকে বুঝতে দেন না। 'তা অবশ্য ঠিক বলেছিস, তুই তাহলে ওর সাথে গল্পের মত করেই বলিস।'

-- বাবা কই মা?
-- রুমে, খেয়ে দেয়ে পেপার পড়তে পড়তে পা দুলাচ্ছে।
-- আজকে ঘরের কাজ করেছে কোন?
-- হুম, বাটিগুলি টেবিল থেকে সরিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে গেছে।
-- ইস মা, কবে যে বাবা মানুষ হবে! তোমার খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অফিস করে রান্না বান্না, ঘর গুছানো..
-- নাহ! কষ্ট হলে ত বুয়াই রেখে দিতাম। তুই ত জানিস, আমি বুয়া বিদায় করেছি, শুধুমাত্র যাতে কাজের ছুতায় আমাদের সবার আরো বেশি কথাবার্তা হয় -- এই জন্য। এই যে কাজের অজুহাতে যখন তখন তোদের টিভি, কম্পিউটার থেকে উঠাতে পারি.. এইটাই বা কম কী? আর সবই ত সওয়াব, না রে? আর তোর বাবা এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রেগুলারলি পড়ছে, এর চেয়ে বেশি আর কী চাই বল?
-- হুম....
-- যাকগে! তুই ঘুমা। বিছানার জঞ্জাল পরিষ্কার করে ঘুমাবি। সকাল বেলা আমি যেন এগুলি না দেখি!

প্রতীতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এত প্ল্যান, কোন কাজেই লাগলনা। ঘরের কাজে মাকে ফাঁকি দেয়া ভারি কঠিন।

অন্য রুম --

-- কী, মেয়ের সাথে আবার কী নতুন প্ল্যান আঁটলে?

-- মেয়ে খুব চিন্তায় আছে স্নিগ্ধাকে নিয়ে।

-- স্নিগ্ধা? ও! পাশের বাসার মেয়েটা? ওর সাথে এখনো যোগাযোগ রাখছে?

-- হ্যা, ক্লাশ, ঘরের কাজ সব কিছুর মধ্যেও ঠিকই সময় বের করে ওকে নিয়ে বের হয়।

-- ভাল ভাল। এই বয়সটাতে মানুষকে সাহায্য করার অভ্যাসটা করালে আখেরে ভাল হবে।

-- হ্যাঁ, মেয়ে ত মাঝে মধ্যে হতাশ হয়ে ফিরে, বলে স্নিগ্ধাকে দেখলে মনে হয় ড্রাকুলা সব রক্ত চুষে নিয়ে গেছে। কথা বলেনা, কোন ব্যাপারে ওপিনিয়ন দেয়না... কোথাও গেলে একশবার মানুষের মুখের দিকে তাকায় কে ওকে দেখছে..

-- লেগে থাকতে বল। ওর নিজের জীবনেও এরকম কত হতাশা আসবে, তখন এই মেয়েকে কীভাবে ঠিক করেছিল মনে পড়লে শক্তি পাবে।

-- দেখতে দেখতে বড়ই হয়ে গেল, না? আর ক'দিন পর পরের ঘরে চলে যাবে।

-- পরের ঘর বলছ কেন? বল মেয়ের নিজের ঘর হবে। আর তোমার মেয়ে কি যেমন তেমন? যে ঘরে যাবে ঘর আলো করে রাখবে।

-- হুঁহ! ঘরের কাজ দেখলে ত মনে হয়না আমার মেয়ে। তখন পুরোই তোমার মেয়ে।

-- আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। কালকে বাটি ধুয়ে রাখব যাও। (পুনরায় পেপারে মনোনিবেশ)

* * *

এ গল্পটার এখানেই ইতি। প্রতীতি স্নিগ্ধাকে কতটুকুবদলাতে পারল সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। প্রতীতির লেগে থাকার উদ্যম, প্রতীতির বাবা মায়ের উৎসাহ, প্রতীতির বলতে পারার ক্ষমতা.. স্নিগ্ধার গ্রহণ করার ক্ষমতা, সর্বোপরি আল্লাহর পক্ষ থেকে গাইডেন্স -- এর সবকিছুর সঠিক সমন্বয়ে গল্পটি খুব সুন্দর পরিণতি নিতে পারে। আবার প্রতীতি হাল ছেড়ে দিলে স্নিগ্ধা নিজ তাগিদেও ঘুরে দাঁড়াতে পারে, জীবনের প্রয়োজনে নিজেই খুঁজে বের করতে পারে সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা, সরলতম পন্থা। এই গল্পের মূল চরিত্র স্নিগ্ধা নয়, প্রতীতিও নয়। প্রতীতির বাবা মা, তাদের দূরদর্শিতা, তাদের আত্মত্যাগ। আসুন আমরা অঙ্গিকার করি আমাদের সন্তানকে তাদের অধিকার থেকে একটুকুবিচ্যুত করবনা। সন্তানের ভবিষ্যৎকে আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য সস্তাদরে বিকিয়ে দেবনা।

* * *

[১] আমার কলেজ জীবনে দেখা প্রত্যেকটা হাত কাটা বান্ধবীর উদ্দেশ্যে লিখলাম। আজও আমার বোনের মুখে শুনি ঘুমের ওষুধ, হাতকাটার এই প্রচলন যায়নি। শুধু একটু আত্মবিশ্বাস আর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর এই মেয়েগুলিকে কত সুন্দর জীবন দিতে পারত, সেটা অভিভাবকেরা কবে বুঝবে?

* * *

7/2/2011, 6:49:00 ***PM***